শিকড় সন্ধানে-১

আতিকুল ইসলাম

শিকড় সন্ধানে-১

আতিকুল ইসলাম
মহাসচিব
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
মোবাইল ঃ ০১১৯-০১০২৮৪১

www.pathagar.com

সৌজন্যে ঃ
এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান খান
নির্বাহী সভাপতি
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

প্রথম প্রকাশ ঃ
৩০ ডিসেম্বর-২০০৭
(মুসলিম লীগ-এর শততম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে)

সারওয়ার-ই-আলম খান
প্রচার সম্পাদক
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ কর্তৃক
অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঃ বাড়ি# ১১০, সড়ক # ২৭, ব্লক# এ,
বনানী মডেল টাউন, ঢাকা-১২১৩ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
মোবাইল ঃ ০১৭১৭-১৭৩৪৫২

বিনিময় মূল্য ঃ ১০ (দশ) টাকা

www.pathagar.com

শিকড় সন্ধানে-১

আতিকুল ইসলাম

[১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে চক্রান্তমূলক যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভ জয়ী হয়ে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেন। ১৭৭০ সালের এপ্রিল মাসে বৃটিশ নাবিক ক্যাপ্টেন জেমস কুক অষ্ট্রেলিয়ার বোটানী বে'তে অবতরণ করে অষ্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতা হরন করেন। তিনি ১৭৭৬ সালে হাওয়াই দ্বীপ দখল করেন। লর্ড ক্লাইভ ও জেমস কুক বিশ বছরের ব্যবধানে ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হাওয়াই দ্বীপে দখলদার হিসাবে বৃটিশ পতাকা উত্তোলন করেন। অষ্ট্রেলিয়া ও হাওয়াই এর শিক্ষা ও সভ্যতা বর্জিত পশ্চাৎপদ অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে বৃটিশরা তাদের দখলদারিত্ব চিরস্থায়ী করেছে।

বৃটিশরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বর্ণবাদী জাতি। কালো গাত্রবর্ণের মানুষদের তারা উল্লাসের সাথে হত্যা করেছে বিশ্বব্যাপী। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে রোডেশিয়ার (জিম্বাবুয়ে) নিগ্রোদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছে। ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হাওয়াই দ্বীপ নিয়ে বৃটিশদের পরিকল্পনা ছিলো অভিন্ন। অন্য দু'টি ভূ-খন্ডের মূল অধিবাসীদের হত্যার মাধ্যমে নির্মূল করা সম্ভব হলেও ভারতীয় ভূখন্ডে তা সম্ভব হয়নি জনসংখ্যার আধিক্য ও বৃটিশ দখলের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আপোষহীন লড়াইয়ের কারণে।]

১. ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে বৃটিশরা ক্রমান্বয়ে ভারত বর্ষ দখল করে নেয়। পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার মুসলমান এবং পরবর্তীতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের হারানো মর্যাদা আর হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যুদ্ধ এবং জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের কোথাও কোন হিন্দু প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি বরং শত শত বছরের মুসলমানদের শাসন অবসানের লক্ষ্যে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। ইংরেজদের কখনো 'ভগবানের আশীর্বাদ' আবার কখনো 'শান্তির দূত' অভিহিত করে হিন্দুরা তাদের শাসন মেনে নিয়েছে সন্তুষ্টিচিত্তে। ফলে প্রতিবাদী, জেহাদী ও যুদ্ধকারী

www.pathagar.com

মুসলমান জনগোষ্ঠী শত বছর ব্যাপী যুগপৎ হিন্দু ও ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়েছে - হয়েছে সর্বশান্ত। অথচ পলাশী যুদ্ধের পূর্বে কি শৌর্য-সাহসে, কি তাহজিব-তমুদ্দুনে, কি চারিত্রিক মাহাত্ম্যে, কি জ্ঞানে গরিমায়, কি শাসন দক্ষতায় মুসলমানরাই ছিলো ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ প্রসংগে ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁর বিখ্যাত দি ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে বলেছেন ঃ "ইংরেজ রাজত্বের শুরুতে যারা ছিলো উন্নতর জাতি, বৃটিশ শাসননীতির কারণে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা হয়ে পড়লেন সর্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ।" উক্ত গ্রন্থে হান্টার আরো লিখেছেন ঃ "বাংলার মুসলমানদের গরীব হওয়া ছিলো অসম্ভব একটি ব্যাপার। আর পলাশী যুদ্ধের পর তাদের পক্ষে ধনী থাকাটা একটি অসম্ভব ব্যাপার।" চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, রাজভাষার পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে মুসলমান সমাজ অবনতি ও দারিদ্রতার নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। এভাবে ১৮৫৭ সালের মধ্যে বাংলার মুসলমানরা তাদের রাজ্য, রাজপদ, জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি সকল প্রকার সরকারী চাকুরী থেকেও বঞ্চিত হয়ে শত বছরব্যাপী অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ বাংলার মুসলমান সমাজ শেষ পর্যন্ত ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিলো।

২. দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরাই সশস্ত্র লড়াই করেছে। ফকির বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ নেতা ফকির মজনু শাহ বুরহানা ১৭৭২ সালে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পলাশী যুদ্ধের পর ফকীর মজনু শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা করেছেন। বাংলার দুর্ভাগ্যের জন্য ইংরেজদের অভিযুক্ত করে বরিশালের বলাকীশাহ ফকীর ১৭৯১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছেন। ভারত থেকে ইংরেজদের উৎখাত করে মুসলিম শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিয়ে সিলেটের আগা মোহাম্মদ রেজা প্রায় ছয় হাজার অনুসারীসহ সিলেট জিলার কাছাড় থেকে ১৭৯৯ সালে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সিলেট জিলার বিভিন্ন স্থানে বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ময়মনসিংহ জিলার শেরপুরের করিম শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ১৮২৫ সালে করিম শাহ'র পুত্র টিপু নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। মীর নিসার আলী তিতুমীরের আন্দোলন ছিলো রাজনৈতিক। ইংরেজ শাসন ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠাই ছিলো

www.pathagar.com

তিতুমীরের মূল উদ্দেশ্য। ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীর শাহাদৎ বরণ করেছেন। ইংরেজরা তাঁর লাশ দাফন না করে পুড়িয়ে ফেলেছিলো।

হাজী শরীয়ত উল্লাহ শরিয়তপুর জেলা থেকে 'ফারায়েজী আন্দোলন' শুরু করে গোটা ভারতে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহসীনউদ্দিন দুদু মিয়া-১ ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। সৈয়দ আহমেদ বেরেলভী প্রতিষ্ঠিত 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া' দিল্লী কেন্দ্রীক হলেও ১৮২০ সাল নাগাদ বাংলায় এই আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। হাজী শরিয়তউল্লাহর মতো তিনিও বৃটিশ শাসিত ভারতকে "দারুল হরব" (শত্রু কবলিত দেশ) আখ্যায়িত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাংলার হাজার হাজার মুসলমান যুবক পায়ে হেঁটে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (বর্তমানে পাকিস্তানে) স্থাপিত মুজাহিদ ঘাঁটিতে পৌঁছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। 'আহলে হাদিস আন্দোলন' উত্তর প্রদেশে (বর্তমানে ভারতে) শুরু হলেও অন্যান্য আন্দোলনের মতো বাংলায়ও এর প্রসার ঘটেছে। মোদ্দা কথা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের যেখানেই কোন আন্দোলন, যুদ্ধ বা জেহাদ হয়েছে তার সব কয়টিতেই বাংলার মুসলমানরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের লক্ষ্য ছিলো ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার এবং তাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। তারপরও মুসলমানদের শত বর্ষব্যাপী মরণপন আন্দোলন বা যুদ্ধ সফল হলোনা কেন? তার কারণ প্রধানতঃ দুটি।

প্রথমটি হলো ঃ মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে একক নেতৃত্ব দেয়ার মতো নেতার অভাবেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ও জেহাদগুলো ব্যর্থ হয়েছে। সেই সংগে নিঃশেষিত হয়েছে তাদের শক্তি আর সম্পদ। দ্বিতীয়টি হলো ঃ মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অবস্থান না নেয়া।

৩. পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার হিন্দুরা দখলদার ইংরেজদের স্বাগত জানায় এবং ভারত থেকে মুসলিম শাসনের অবসান হয়ে যেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সেই লক্ষ্যে হিন্দুরা সর্বাত্মক সহায়তা করেছে। বিনিময়ে কোম্পানীর কাছ থেকে তারা চাকুরীসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে। ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজ ও হিন্দুদের

www.pathagar.com

ছিলো অভিন্ন শত্রু। সুতরাং অভিন্ন শত্রুকে শোষণ ও জুলুম করে সর্বশান্ত করার লক্ষ্যে ইংরেজ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে আপনা থেকেই একটি ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে উঠেছিলো। এ প্রসংগে কয়েকটি তথ্য উপস্থাপন করলেই পাঠকদের কাছে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ঃ

১৭৭৬ সালের ২৭ নভেম্বর ওয়ারেন হেষ্টিং কে লেখা এক চিঠিতে লর্ড ক্লাইভ উল্লেখ করেছেন যে, "মুসলমানদের প্রতি সদয় ব্যবহার করলেও তারা কখনো আমাদের (ইংরেজ) প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব পরিবর্তন করবে না"। ১৮১৩ সালে সিলেক্ট কমিটিকে স্যার জন ম্যাকলম ও ক্যাপ্টেন টি. ম্যাকান জানান ঃ 'আমাদের (বৃটিশ) প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের আনুগত্য আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রধান শক্তি।' একই কমিটিকে টি. ম্যাকান জানান ঃ "মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত।" একই কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যে কর্ণেল টমাস মনরো বলেন : "যতদিন হিন্দুরা বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকবে ততদিন মুসলমানদের অসন্তুষ্টি কোম্পানী সরকারের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।" পলাশী যুদ্ধের প্রায় ১০০ শত বছর পর ১৮৪৩ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অ্যালেন বুরো এক চিঠিতে ডিউক অব ওয়ালিংটনকে জানান ঃ "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুসলমান জাতি মূলতঃ আমাদের প্রতি বৈরী। তাই হিন্দুদের সমর্থন ও আস্থা অর্জন আমাদের শাসন নীতির মূল লক্ষ্য।"

ভাবতে অবাক লাগে যে, শুধুমাত্র মুসলমানদের অবদমিত ও আর্থিকভাবে সর্বশান্ত করার স্বার্থে হিন্দুরা ১৯০ বছর ব্যাপী ভারত শাসনের সুযোগ দিয়েছে বৃটিশকে এবং সেই সংগে ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠন করে বৃটেনে নিয়ে যাবার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। অথচ এই পাহাড়সম সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয় করেছিলো মুসলমানরা। শত শত বছর ধরে ভারত শাসনের পাশাপাশি মুসলমান শাসক ও বাদশাহগণ ভারতকে প্রাচ্যের একটি সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন।

৪. পলাশীযুদ্ধের পর বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ এবং বৃটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যুগ যুগের সঞ্চিত ক্ষোভ ও ঘৃণা সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষেত্রকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছিলো। উপরোন্ত ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর বিচ্ছিন্ন ১৬টি যুদ্ধের ঘটনা

www.pathagar.com

ভারতের জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস ও শক্তি যুগিয়েছিলো।

মুসলমানদের জেহাদ ও যুদ্ধের পথ ধরে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয়েছে সর্বভারতীয় সিপাহী বিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে মূলতঃ বাংলা হতে। পরবর্তীতে তা ভারতের বিভিন্ন সেনা ছাউনীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্রোহী সিপাহীদের শ্লোগান ছিলোঃ খালক্-ই-খুদা, মুলক-ই-পাদশা, হুকুম-ই-সিপাহ্ (পৃথিবী সৃষ্টার, সাম্রাজ্য বাদশার, নেতৃত্ব সিপাহীর)। ১৮৫৭ সালের মে মাসের প্রথম থেকেই বিদ্রোহ জটিল আকার ধারণ করে। মীরাটের বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর লাল কেল্লায় উপস্থিত হয়ে ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্ব দাবী করে। সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক শোষক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী সিপাহীদের সংগ্রামী চেতনাকে সমর্থন করে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর দলখদার বিদেশী শাসকদের বিপক্ষে অস্ত্রধারনের জন্য ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে এক "ফরমান' প্রচার করেন। সম্রাটের এই আহ্বানের পরপরই সিপাহী বিদ্রোহ সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। মূলতঃ মুসলমান নেতৃত্বই ছিলো ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের চালিকা শক্তি। এ প্রসংগে স্যার জেমস এর মতে "বিপ্লবী মুসলমানগনই ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের মূল শক্তি"।

এই যুদ্ধে বৃটিশরা পরাজিত হলে ভারতে পুনরায় মুঘল সম্রাটের নেতৃত্বে মুসলমানদের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এই আশংকায় ইংরেজদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত নব্য ভূ-স্বামী, জমিদার ও এলিট শ্রেণী চলমান মহাবিদ্রোহের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে ইংরেজদের সহযোগিতা ও সমর্থন করেছে। ফলে পলাশী যুদ্ধের ১০০ বছর পর ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সংঘটিত সর্বশেষ স্বাধীনতা যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সিপাহী যুদ্ধ ব্যর্থ হবার পর পুনরায় যেন বৃটিশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃত্বে আর কোন বিদ্রোহ সংঘটিত হতে না পারে সেই লক্ষ্যে ইংরেজরা ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে দিল্লী থেকে বার্মায় নির্বাসন দিয়ে সম্রাটের সকল শাহজাদাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো। নির্বাসিত থাকাবস্থায় রেঙ্গুনেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদূর শাহ জাফরের কবর ভারতে হয়নি- এতই বদনসিব এই হতভাগ্য সম্রাটের। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ১০০ শত বছর পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে অসংগটিত উলামায়ে কেরাম, পীর, ফকির ও দরবেশের নেতৃত্বে জেহাদী চেতনায়

www.pathagar.com

উজ্জীবিত মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন অথচ ধারাবাহিক লড়াইয়ের ফলে দখলদার ইংরেজরা দিশেহারা অবস্থায় থাকতো। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর ইংরেজরা ভারতব্যাপী হাজার হাজার আলেম-উলেমাসহ স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের হত্যা করে শত বছরের প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ চরিতার্থ করেছে।

ভারতের সর্বত্র আলেম, উলামা ও মুজাহিদসহ কতো স্বাধীনতা সংগ্রামী ফাঁসিতে বা বুলেটে শহীদ হয়েছেন সেই সংখ্যাতীত হিসাব আর পাওয়া যাবে না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলায়ও বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসি দিয়েছে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রবর্তিত 'পঞ্চম বিধি' স্থানীয় বৃটিশ নাগরিকদের কোর্ট মার্শালের ক্ষমতা প্রদান করে। ১৮৫৭ সালের ২৩ নভেম্বর ঢাকায় তিনজন সিপাহীর এবং বিদ্রোহে সহযোগিতা করার অজুহাতে লালবাগ কেল্লার সুবেদার ও তাঁর স্ত্রীকে ফাঁসি দেয়া হয় সংক্ষিপ্ত সময়ের বিচারে। কারা অভ্যন্তরে ফাঁসি দেয়ার বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন ও জনমনে ভীতি সৃষ্টির জন্য সিপাহীদের ফাঁসি দেয়া হয় প্রকাশ্যে। যশোহরের ত্রিমোহিনীতে হাটের দিন কথিত অভিযুক্ত সিপাহীদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে জনগনের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে লাশগুলো সারাদিন উন্মুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখে। ঢাকার সদরঘাট সংলগ্ন 'আন্টাঘর ময়দান' পরবর্তীতে 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কে বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেয়ার পর তাদের লাশ মাসের পর মাস প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রেখে ইংরেজরা ঢাকাবাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্থ রাখতে চেয়েছিলো। বাংলা, মীরাট, সাহারানপুর, আগ্রা, দিল্লীসহ গোটা ভারতে পৈশাচিক উন্মত্ততায় মুসলমান হত্যার এতবড় হৃদয় বিদারক ঘটনা ভারতের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

সিপাহী যুদ্ধের পর মুসলমানদের এমন এক শোচনীয় অবস্থানে ও আর্থিক অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয়া হয় যেন তারা পুনরায় যুদ্ধ করতে বা স্বাধীনতার জন্য আর কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। দখলদার ইংরেজরা এক্ষেত্রে সফল হয়েছিলো। ১৮৫৭ সালের পর ভারতের সর্বশান্ত মুসলমানগন আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার মতো শক্তি, সাহস ও মনোবল গড়ে তুলতে পারেনি। তবে সিপাহী বিদ্রোহের পর পরই ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন অবসান হয়ে বৃটিশ শাসন চালু হয়।

৫. বাহাদুর শাহ জাফরের মতো আরেকটি হৃদয় বিদারক ঘটনা পাওয়া

www.pathagar.com

যায় ভারতের ইতিহাসে। ইতিহাসের সেই নায়ক হলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ত্রাস, ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক, অকুতোভয় বীর মুজাহিদ, মুসলিম জাতিসত্তা ও ঈমানী চেতনার অন্যতম প্রতীক, মহীশূরের শাসক, শের-ই-মহীশূর শহীদ টিপু সুলতান। ১৭৯৯ সালের ৪ মে মহীশূরের (ভারতে) শ্রীরঙ্গাপত্তনমের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর হাতে তিনি শাহাদৎ বরণ করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক পি.টি. নায়ার বলেছেন: "টিপু সুলতানই হচ্ছেন ভারতের একমাত্র শাসক, যিনি নিজ দেশের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে শাহাদাৎ বরণকেই শ্রেয় ঃ বলে মনে করেছিলেন। নিজাম বা মারাঠাদের মতো তিনি বৃটিশদের সংগে হাত মিলিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেননি।" ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত কোন মুসলমানই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বশ্যতা স্বীকার করেনা– হাজার বছর যাবৎ বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং ভবিষ্যতেও স্থাপন করবে ইনশাল্লাহ্।

টিপু সুলতানের শাহাদতের পর তাঁর হীরা জহরৎ, সোনা দানা ও নগদ অর্থসহ বিপুল পরিমানের অস্থাবর সম্পত্তি ইংরেজরা লুণ্ঠন করে তাঁর শাহী পরিবারকে বন্দী করেছে। ভেলোরে টিপু সুলতান যে দূর্গটি নির্মাণ করেছিলেন সেই দূর্গে ১৭৯৯ সালের জুন মাসে টিপু সুলতানের পরিবার পরিজনকে লর্ড ওয়েলেসলী অন্তরীণ করেছিলো।

১৮০৬ সালের জুলাই মাসে ভেলোরে সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ করে। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করে। তারা নিশ্চিত হয় যে, এই বিদ্রোহের নেপথ্যে টিপু সুলতানের পরিবারের সমর্থন রয়েছে। ইংরেজরা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং মহীশূরে যেন ভবিষ্যতে কোন বিদ্রোহ হতে না পারে সেই লক্ষ্যে টিপু সুলতানের মহিয়ষী বেগম, তার ১২ জন পুত্র ও ভাইসহ শাহী পরিবারের আরো ৫২ জনকে কলিকাতার টালিগঞ্জে অবস্থিত এক ইংরেজের মালিকানাধীন তিনটি ছোট বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে। ২৪ পরগণার কালেক্টরের অনুমতি ছাড়া টিপু সুলতানের পরিবারের কেউ বাড়ীর বাইরে যেতে পারতো না। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মকর্তা টিপু সুলতানের পরিবারের উপর নজর রাখতো। দীর্ঘকাল টিপু সুলতানের পরিবার পরিজন এভাবেই ছিলেন গৃহবন্দী।

নিজেদের ভরণ পোষণ ও ইসলামী দাতব্য কাজের ব্যয় বহনের জন্য ইংরেজরা টিপু সুলতানের পরিবারের জন্য সম্মানজনক মাসোহারার ব্যবস্থা রেখেছিলো। তা থেকে সঞ্চয় করেই কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

এলাকায় তারা প্রচুর সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন। বর্তমানে ভারতের বাজার দরে এই সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১৫০০ শত কোটি টাকার মতো অথচ হৃদয় বিদারক ঘটনাটি হলো যে, এই বিপুল অংকের অর্থের মালিক হবার পরও টিপু সুলতানের পরিবারের অধঃস্তন পুরুষ সদস্যরা বর্তমানে কলকাতায় রিক্সা চালায় – নারী সদস্যরা বাসাবাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। টালিগঞ্জের প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের বস্তি এলাকায় তাঁরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। দখলদার ইংরেজদের পরাজিত করে ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখার স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত টিপু সুলতানের পরিবারের বিপুল সম্পত্তি ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিরা আজো দখল করে রেখেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই ছিলো টিপু সুলতানের অপরাধ-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশদের চোখে তো বটেই এমনকি ১৯৪৭ সালের পর স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টিতেও।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি, আজাদ হিন্দ ফোর্সের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ায় আমৃত্যু অন্তরীন থাকতে হয়েছে কংগ্রেস নেতাদের ষড়যন্ত্রের কারণে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য ফকির মনজু শাহ, আগা মোহাম্মদ রেজা, টিপু সুলতান, সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর, সৈয়দ নেসার আলী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুসহ অসংখ্য নেতা ও স্বাধীনতাকামী যারা জীবন দিয়েছেন তারা সকলেই ভারতীয়দের কাছে আজ মৃত অথচ মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে মারাঠা নেতা শিবাজী ভারতীয়দের কাছে জাতীয় বীর, গৌরব আর অহঙ্কারের প্রতীক। সত্যি সেলূকাস, কি বিচিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৬. প্রায় দু'হাজার বছর ধরে হিন্দু সমাজ জাতিভেদ প্রথার কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ধর্মের নামে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয় বিধায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদেরকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয় বৃটিশ সরকার। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের উৎসাহ ও সমর্থনে এবং অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ কর্মকর্তা এ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই দলের নেতা ছিলেন কট্টর মুসলিম বিরোধী শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি।

www.pathagar.com

দল গঠনের শুরু থেকেই ইংরেজদের বিখ্যাত থিওরী 'ডিভাইড এন্ড রুল' পরিকল্পনা মতে কংগ্রেস নেতারা মুসলিম বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। চরম সাম্প্রদায়িক শ্রী বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে কতিপয় কট্টর রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতা কংগ্রেসে যোগদান করে হিন্দুত্ববাদী পুনরুত্থান আন্দোলন শুরু করেন এই বলে যে, "ভারতবর্ষে দু'টি আলাদা জাতি (Two Nation theory) র বসবাস। একটি হিন্দু জাতি অপরটি মুসলমান জাতি। মুসলমানরা যেহেতু আরব থেকে এসে ভারতবর্ষ দখল করে শাসন করেছে সেহেতু তাদের এবার আরবে ফিরে যেতে হবে"। হিন্দুত্ববাদী পুনরুত্থানের লক্ষ্য নিয়ে শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক তাঁর অনুসারীদের নিয়ে 'শিবাজী উৎসব' পালনসহ গো-হত্যা নিবারণের জন্য 'গো-রক্ষা সমিতি' গঠন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন ভারতব্যাপী। কংগ্রেস নেতাদের মুসলিম জাতিসত্ত্বা বিরোধী কার্যকলাপ এবং সেই সংগে আলীগড় কলেজের সাবেক দুই অধ্যক্ষ থিউডোর বেক ও থিউডোর ম্যারিসন নামে দু'জন ইংরেজের প্ররোচনায় হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ১৮৯৫ সালে মধ্য ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম যে হিন্দু-মুসলিম দাংগার সূচনা হয়েছিলো তা আজো ভারতবর্ষে থেমে থেমে সংগঠিত হচ্ছে। অন্যদিকে ধর্মীয়ভাবে মুসলমানরা অসাম্প্রদায়িক বিধায় ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের এই ভূখন্ডে হিন্দু মুসলিম কোন দাংগা হয়নি-ভবিষ্যতেও হবেনা ইনশাল্লাহ্।

৭. ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন পূর্ব বংগ সফরে এসে মেহমান হিসাবে নবাব সলিমুল্লাহর পৈতৃক বাসভবন 'আহসান মঞ্জিলে' অবস্থান করে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নিয়ে নবাবের সংগে আলোচনা করেন। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা সমর্থন করে নবাব সলিমুল্লাহ বলেন যে, 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশ পূর্ব বংগের রাজধানী ঢাকা হলে কোলকাতার কর্তৃত্ব লোপ পাবে ফলে নতুন প্রদেশের পশ্চাৎপদ জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি হবে।'

লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা মোতাবেক ১৯০৫ সালে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে পূর্ববঙ্গ নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয় এবং নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। ইতিহাসে তা 'বঙ্গভঙ্গ' নামে অভিহিত। বঙ্গভঙ্গের ফলে নবগঠিত পূর্ব বঙ্গ প্রদেশের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও শোষিত মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির পথ খুলে যায়। কিন্তু কলকাতার বর্ণবাদী

www.pathagar.com

ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গ মেনে নেয়নি। তাঁরা বাংলাকে অখণ্ড রেখে পূর্ব বংগের মুসলমানদের শোষণ করাসহ তাদের পদদলিত রাখার লক্ষ্যে বংগভংগের বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়। তারা বঙ্গভঙ্গকে বঙ্গমাতার অংগহানি উল্লেখ করে মন্দিরে মন্দিরে পূজা প্রদান সহ বঙ্গমাতাকে পূনঃ একত্রীকরণের শপথ গ্রহণ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাকে অখন্ড রাখার জন্য 'রাখী বন্ধন', 'গংগা স্নান' ইত্যাদি প্রথা চালু করেন। সে সময় তিনি অখন্ড বাংলার জন্য 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি রচনা করেন। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপর হিন্দুদের প্রাধান্য ও আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বংগভংগ বাতিলের দাবীতে ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করে।

৮. পূর্ব বংগের হাতে গোনা কয়জন মুসলমান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ইতিপূর্বে নবাব সলিমুল্লাহ 'মোহামেডান প্রভিনশিয়াল ইউনিয়ন' নামে প্রদেশকেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক সমিতি গঠন করেছিলেন কিন্তু বংগভংগ কার্যকরী হবার পর থেকে বাংলার এবং পরবর্তীতে কংগ্রেসের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের মুসলিম বিরোধী তৎপরতা ও বংগভংগের বিরুদ্ধে তাদের অনমনীয় অবস্থান লক্ষ্য করে ৩৩ বছরের দূরদর্শী তরুণ নেতা নবাব সলিমুল্লাহ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্ব ভারতীয় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নবাব সলিমুল্লাহর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স' এর বিশতম অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে দেড় হাজার মুসলিম প্রতিনিধি ও পাঁচশত দর্শক এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মেজবান হিসাবে নবাব সলিমুল্লাহ এই অধিবেশনের সমুদয় খরচ ও মেহমানদের যাবতীয় ব্যয়ভার এককভাবে বহন করেন।

এই অধিবেশনকে সফল করতে নবাব সলিমুল্লাহ'র ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহকর্মী এ, কে, ফজলুল হক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি গোটা ভারত ঘুরে ঘুরে মুসলিম নেতাদের ঢাকা সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে প্রত্যেকের কাছে নবাব সলিমুল্লাহর ব্যক্তিগত দাওয়াতনামা হস্তান্তর করেছেন। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, হাকিম হাবিবুর রহমান, নবাব শামসুল হক প্রমুখ নেতারা এই অধিবেশন সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯০৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকার শাহবাগস্থ নবাব

www.pathagar.com

সলিমুল্লাহ'র বাগানবাড়ী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান মধুর ক্যান্টিন ও চারুকলা ইনস্টিটিউট এলাকা) তে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি ব্যারিষ্টার শরফুদ্দিন এর সভাপতিত্বে 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এ্যাডুকেশনাল কনফারেন্সের' বিশতম অধিবেশন শুরু হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসাবে নবাব সলিমুল্লাহ স্বাগতঃ ভাষণ দেন। ২৯ ডিসেম্বর এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে।

৩০শে ডিসেম্বর সকালে বিশেষ সভায় নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে এবং মাজহারুল হকের সমর্থনে নবাব ভিকার-উল-মূলক মওলভী মোস্তাক হোসেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় একটি রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নবাব মুহসিন-উল-মূলক, হাসান ইমাম, সাহেবজাদা আকতার আহমেদ, রাজা নওশেদ আলী প্রমুখ নেতারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খা ও জাফর আলী খার যৌথ সমর্থনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রায় দু'হাজার শীর্ষ নেতা ও ব্যক্তিত্বদের সমর্থনে নবাব শায়েস্তাখার স্মৃতি বিজরিত শহর জাহাঙ্গীর নগর পরবর্তীতে পূর্ব বংগের রাজধানী ঢাকায় এক দূরদর্শী রাজনীতিক, বাংলার মুসলমানদের অবিসংবাদীত নেতা নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর গঠিত হলো 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' যা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে মুসলিম জাতিসত্ত্বা ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেতনা নিয়ে গঠিত প্রথম রাজনৈতিক দল।

৯. মুসলিম লীগ গঠন ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইংরেজ শাসনের শেষ ৫০ বছর বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণের কাল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯০৬ সালে গঠিত মুসলিম লীগ ছিলো এই জাগরণের মূল চেতনা। ইংরেজদের সীমাহীন শোষণ ও তাদের সহযোগী হিন্দুদের অবর্ননীয় জুলুম, নির্যাতন ও লুণ্ঠনের ফলে শত শত বছর ধরে আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ ও সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ শাসনের ১৩০ বছরের মধ্যে যথার্থ অর্থেই একটি ভূমিদাস জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলো। কিশোরগঞ্জ জেলার জমিদার প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রী নিরোধ কুমার চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত 'অটোবাইয়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান" গ্রন্থে লিখেছেন : "ভূমি সংলগ্ন মুসলমানদের আমরা গৃহপালিত

www.pathagar.com

গবাদি পশু বলেই জ্ঞান করতাম।"

আসলেও তখনকার কৃষিজীবি মুসলমান জনগোষ্ঠী আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানগত দিক দিয়ে জীবজন্তুর স্তরেই চলে গিয়েছিলো। তাদের কোন সংগঠন ছিলো না। অচিন্ত্যনীয় শোষণ আর জুলুমের প্রতিবাদ করার ভাষা তারা জানতো না। শোষিত হয়েও তারা ছিলো জন্তু জানোয়ারের মতো নির্বাক। পতনের এই শেষ স্তরে পৌঁছে যাবার পর বৃটিশ শাসিত ভারতের সর্বাপেক্ষা নির্যাতীত, শোষিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী বাংলার মুসলমানদের পুনরুদ্ধারে যিনি প্রথম এগিয়ে এসেছেন, তিনি বাংলার ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ, ভারতীয় মুসলমানদের সাংগঠনিক রাজনীতির জনক, দানবীর নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর।

ভারতীয় কংগ্রেস, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে হিন্দুদের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদের কারণে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার হলে বৃটিশ সম্রাট রাজা পঞ্চম জর্জ এক ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ বাতিল করেন এবং বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিভক্ত করে দু'টি স্বতন্ত্র প্রদেশের ঘোষণা দেন। বাংলা প্রদেশ থেকে বিহার ও উড়িষ্যাকে বিভক্ত করে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হলেও এ ব্যাপারে কলকাতার হিন্দু নেতারা কোন প্রতিবাদ করেনি কারণ তাদের জমিদারী ও শোষণের কোন ক্ষেত্র ঐ দু'টি প্রদেশে ছিলোনা। একই সংগে রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরেরও ঘোষণা করেন। রাজধানী স্থানান্তরের মতো এতোবড় সর্বনাশা ঘোষণাও কলকাতার হিন্দু নেতারা মেনে নিয়েছিলেন শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত করার আনন্দে।

বঙ্গ ভঙ্গ রহিত করার জন্য বৃটিশ সম্রাট রাজা পঞ্চম জর্জকে 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' হিসাবে অভিহিত করে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গানটি রচনা করেছিলেন ১৯১১ সালে। সে দিন থেকে আজকের স্বাধীন ভারতে 'ভাগ্য বিধাতা' হিসাবে রাজা পঞ্চম জর্জ প্রতিদিন ভারতীয়দের কাছে পূজিত হচ্ছেন। উল্লেখ্য, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

১০. বঙ্গভঙ্গ রহিত ও রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনায় বাংলার মুসলমানরা এবং নবাব সলিমুল্লাহ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং সেই সংগে তিনি উপলব্ধি করেন যে, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুদের মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে মোকাবিলা করতে হলে বাংলার মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী করেন। বাংলার ক্ষুব্ধ

www.pathagar.com

মুসলমানদের শান্ত করতে ইংরেজ সরকার নবাবের দাবী মেনে নিয়ে ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। নবাব সলিমুল্লাহ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি থেকে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকায় ১০০ একর জমি দান করেন। এবার কলকাতার বাবুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতার মতো নতুন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধীতায় অবতীর্ণ হন। পূর্ব বংগের 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবন'রা যেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারে সেই জন্যই তারা সাম্প্রদায়িক নোংরা তৎপরতায় লিপ্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাত্র ১ মাস ২৬ দিনের মাথায় তারা কলকাতার গড়ের মাঠে একটি প্রতিবাদ সভা করেন ১৯১২ সালের ১৮ মার্চ। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সভায় 'পূর্ব বংগের মুসলমান চাষা-ভূষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করা হয়।

১৯১৫ সালে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে নবাব সলিমুল্লাহ কলকাতায় ইন্তেকাল করেন (জনশ্রুতি আছে যে, নবাবের মৃত্যু বিষ প্রয়োগের কারণে হয়েছিলো)। নবাবের 'ব্রেইন চাইল্ড' খ্যাত এ, কে, ফজলুল হক ও টাংগাইল জেলার ধনবাড়ীর জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেন। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর জমিদারীর কিছু অংশ বিক্রি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যে অর্থ সেদিন দান করে ছিলেন তা আজকের বাজারে প্রায় ১৫ কোটি টাকার সমতুল্য।

বৃটিশ ও বর্ণবাদী হিন্দুদের অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতন থেকে বাংলার মুসলমানদের গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ভবিষ্যৎ পথ যারা সৃষ্টি করে গেছেন তারা হলেন ফকীর মজনু শাহ বুরহানা, শহীদ সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীর, হাজী শরীয়ত উল্লাহ, পীর মহসীনউদ্দিন দুদু মিয়া-১ প্রমুখদের উত্তরসুরী নবাব সলিমুল্লাহ, শের-এ-বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, স্যার সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ। তাঁরা স্ব-জাতি প্রেমে একতাবদ্ধ, ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেতনায় শৃংখলা সমৃদ্ধ এক একজন অগ্নি পুরুষ। তাঁরাই আমাদের রাজনীতির পূর্ব পুরুষ, জাতি সত্ত্বার দিক নির্দেশক এবং অস্তিত্বের মূল শিকড়।

১১. ১৯৪০ সালে শের-এ-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক উত্থাপিত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' বাংলার মুসলমানদের অন্তরে ১৮৩ বছরের

www.pathagar.com

স্বাধীনতার সুপ্ত আকাংখা প্রজ্বলিত করে তুলে। ব্যক্তিজীবনের সকল সুখ শান্তি পদদলিত করে যারা ভারত বিভক্ত করে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলেন তারা হলেন : মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক বাংলার প্রথম মুসলিম মূখ্যমন্ত্রী শের-এ-বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, মুসলিম লীগ নেতা বাংলার দ্বিতীয় মুসলিম মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন, মুসলিম লীগ সম্পাদক অখণ্ড বাংলার শেষ মূখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী; বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সভপতি, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক ও অধূনালুপ্ত দৈনিক আজাদ এবং মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক মাওলানা আকরাম খা; বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সম্পাদক পণ্ডিত আবুল হাশিম; আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমূখ।

উল্লেখিত নেতাদের সমর্থনে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও পণ্ডিত আবুল হাশিম নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অনুমোদন নিয়ে বাংলাকে অখন্ড অবস্থায় স্বাধীন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতা মহাত্মা (?) গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং বল্লভ ভাই প্যাটেলের পরিকল্পনায় কলকাতার বর্ণবাদী হিন্দুরা বাংলাকে বিভক্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান দাংগা বাধিয়ে ছিলেন। কারণ অখন্ড বাংলা স্বাধীন হলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে বাংলা শাসন করবে, বর্ণ হিন্দুরা তা মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গভংগকে যারা বঙ্গমাতার অংগ হানি বলে আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করেছিলেন তারাই আবার ৪০ বৎসর পর বঙ্গমাতার অঙ্গহানি ঘটিয়ে বাংলাকে বিভক্ত করে প্রমাণ করলেন যে, হিন্দু আর মুসলিম বাংলা ভাষায় কথা বললেও তারা স্বতন্ত্র দু'টি জাতি (দ্বিজাতি তত্ত্ব)। ফলে কলকাতার বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতারাই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট 'বাংলা মায়ের' দেহকে দ্বিখণ্ডিত করলেন। বিভক্ত দু'বাংলার এক অংশ পূর্ববংগ থেকে পূর্ব পাকিস্তান এবং সেখান থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যেখানে বাংলা রাষ্ট্রভাষা। অপর খণ্ডিত অংশ ১৯৪৭ সাল থেকে হিন্দি ভাষাকে উদরস্থ করে দিল্লী শাসিত একটি রাজ্য-পরাধীন পশ্চিম বাংলা।

পড়ুন ঃ শিকর সন্ধানে-২

www.pathagar.com